দুর্গাপূজার দু-এক কথা

স্বামী দিব্যানন্দ

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তাই ভারতীয় জীবনযাত্রায় পূজা শুধু বাহ্যিক আচারবিশিষ্ট কোনও ক্রিয়ানুষ্ঠান নয়, পূজা এখানে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে সব বর্ণ, সব জাতিই স্বাধীনভাবে তাদের পূজানুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে কোনও পূজাকে যদি জাতীয়পূজা বলে উল্লেখ করতে হয়, তবে তা হল শারদীয়া দুর্গোৎসব।

এসেছে শরৎ। বেজেছে তার প্রথম আলোর চরণধ্বনি।
ধরণীর ধূলিকে করুণায় ধৌত ধন্য করতে আসছেন যিনি,
তাঁর মূর্তি ভাবময়ী, পূজাও ভাবের পূজা।
এ-মহাপূজার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধে।

একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হল দুর্গাপূজা বাঙালির পূজা। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেবী দুর্গা ''কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গুলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে 'কল্যাণী' নামে, মিথিলায় 'উমা' নামে এবং কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী' নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। এইরূপে হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং দ্বারকাপুরী ও বেলুচিস্তানের হিঙ্গলাজ হইতে পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বস্থানে শারদীয়া পূজা অথবা নবরাত্র নামে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।'' ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যখন দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হয়, ঠিক সেইসময় দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা পালন করেন 'নবরাত্রি' উৎসব—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গাকে একসঙ্গে আরাধনা। প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় রাতে এই পূজা হয় বলে এ-হেন নাম। এর পাশাপাশি উত্তরভারতে চলে দশেরা উৎসব। দশমীর দিন দশমুণ্ড রাবণের এক বিশাল মূর্তি তৈরি করে রাবণবধের বিজয়োৎসব পালিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা-নবরাত্রি-দশেরা এই তিনটি নিয়েই দেশ জুড়ে শারদোৎসব। কিন্তু এসবের মূলে যে-দেবী দুর্গা, কে তিনি? ''কা হি সা দেবী?''

দেবী দুর্গা বৈদিক দেবতা কি না বা তন্ত্র বেদপূর্ব কি না সে-বিষয়ে সর্বসম্মত কোনও সিদ্ধান্ত নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশ্বাস করতেন যে দেবীপূজা তথা শক্তিবাদ বৌদ্ধধর্মেরই পরিণতি। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারও মনে করেন, দুর্গা বৈদিক দেবতা নন। তাঁর মতে অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে তাদের দেবতা দুর্গা, আর্যসভ্যতার দেবতা বলে প্রচারিত হন। এই মত প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত প্রমাণ সহযোগে দুর্গাকে অনার্যদেবতা বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অপরদিকে স্বামী শংকরানন্দ স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে তন্ত্র বৈদিক, বেদেরই আনুষ্ঠানিক অংশ। বেদাগমের শিবপ্রোক্ত আদ্যাস্তোত্রে স্বয়ং শিব বলেছেন, 'ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।' দশমহাবিদ্যার মূল আদ্যাশক্তি দক্ষিণা কালিকার সঙ্গে দুর্গার অভিন্নতা বিষয়ে এরপর আর কোনও সন্দেহ থাকে না। দশমহাবিদ্যার উপাখ্যানটি পৌরাণিক, তেমনি তন্ত্রেও দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিকে আদ্যাশক্তি মহামায়ার এক-একটি রূপ বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্‌বেদে দুর্গার বিশেষ উল্লেখ নেই। সেখানে রুদ্র বা শিবের কথা পাওয়া যায়। তবে শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনীয় সংহিতাতে আমরা প্রথম অম্বিকা দেবীর নাম পাই। সেখানে তিনি রুদ্রের ভগিনী। উমার উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় কেনোপনিষদে। উমার পরিচয় সেখানে হৈমবতী—পর্বত হিমবতের কন্যা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, ''তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং/ বৈরোচণীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে/ সুতরসি তরসে নমঃ।" দুর্গার দুটি নামান্তর 'কন্যাকুমারী' ও 'কাত্যায়নী' দুর্গাগায়ত্রীতে বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্তেও দুর্গার উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বৃহদ্দেবতা'তে (২।৭৮,৭৯) বলা হয়েছে অদিতি, বাক্, সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন।

দুর্গা শব্দের নানা অর্থ। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ আছে,

''দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়ে চাতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥"

দুর্গা শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ। আ শব্দ হন্তৃবাচক। এই সকলকে হনন করেন যে-দেবী তিনিই 'দুর্গা' নামে পরিকীর্তিতা।

আবার দেবী স্বয়ং চণ্ডীতে (১১।৪৯, ৫০) বলেছেন,

''তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ 'দুর্গম' নামে এক ভয়ংকর অসুরকে বধ করে আমি দেবী 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হব।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে—

''নারায়ণী মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গেতি স্মৃতিমাত্রেণ যাতি দুর্গং নৃণামিহ॥"

অর্থাৎ দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী। তাঁর স্মরণেই মানবকুলের দুর্গতিনাশ হয়।

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে আছে—

''অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ॥"

অর্থাৎ অতিদুর্গম দুর্গদৈত্যকে সমরে বধ করায় আজ থেকে আমার খ্যাতি হবে দুর্গা নামে। যে আমার শরণ নেবে, তার কখনও দুর্গতি হবে না।

অন্যমতে দুর্গা শব্দের অর্থ দুর্গ অর্থাৎ দুর্গতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবীপুরাণে দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা দুর্গেশ্বরী বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রচলিত মতে দেবী দুর্গতি ও শঙ্কা হরণ করেন বলে তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীকে কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা,

পার্বতী, কৌষিকী, বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার দেবীকবচে এক দুর্গারই নয়টি নামকরণ করেছেন পিতামহ ব্রহ্মা—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। দুর্গার এই নয়টি কায়ব্যূহ মূর্তি একত্রে 'নবদুর্গা' নামে খ্যাত।

দুর্গার আরও নানা রূপ আছে। চণ্ডীতেই দুর্গার তিনটি রূপের কথা পাওয়া যায়। দুর্গারূপে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। মধুকৈটভ বধের জন্য আবির্ভূত হন দুর্গার অংশজাতা মহাকালী, এবং শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন দুর্গারই অংশরূপা কৌষিকী। এই কৌষিকী আসলে জয়দুর্গা—গণেশাদি পঞ্চদেবতার অন্যতম; যাঁর পূজা প্রচলন করেন স্বয়ং আচার্য শংকর। এঁর ধ্যানমন্ত্র : ''কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং/ শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।/ সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং/ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

কিন্তু 'দুর্গা' বলতে দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গার পরিবারসমন্বিতা রূপই বহুল প্রচলিত। গবেষক বিমলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে কুষাণ যুগের 'ননা' মূর্তিই পরবর্তী কালে মহিষমর্দিনী (দুর্গা) রূপে মূর্ত। তাঁর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে : তিনি জটাজূটসমাযুক্তা, মাথায় অর্ধচন্দ্র, তিনি ত্রিনয়না এবং পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর বদন। তাঁর অতসী ফুলের মতো গায়ের রং। তিনি নবযৌবনসম্পন্না। সুচারু তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি অবস্থিত। দশ হাতে দশপ্রহরণধারিণী। তাঁর ডানদিকের হাতগুলিতে আছে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি; আর বামদিকে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, পরশু। দেবীর পদতলে ছিন্নশির মহিষ। তার থেকে উৎপন্ন দানব দেবীর ত্রিশূলে বিদ্ধ। দেবীর ডান পা সিংহের পিঠে আর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল অসুরের কাঁধে। এ-হেন অসুরদলনী রূপের সঙ্গে কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী কীভাবে যুক্ত হলেন? গবেষক দত্ত মহাশয় লিখেছেন, ''ঋগ্বেদে আছে—'জ্যোতিষ্মতীমদিতীং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীমা'—(যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন) এই বেদি বা কুণ্ডের দশদিক দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে কয়েকজন ছোট দেবতার মূর্তি রাখা হত। তাদের মধ্যে একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করে থাকেন—এই যোদ্ধা দেবতা কার্তিক। একজন সেই কুণ্ডে যজ্ঞ শুরু করেন— তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ—এজন্য তিনি চারহাত বিশিষ্ট। একজন দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী—এই মূর্তিমান বেদজ্ঞান হলেন দেবী সরস্বতী। আর এই যজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যিনি দান করেন তিনি লক্ষ্মী।... দেবসেনাপতি কার্তিক ক্ষাত্রশক্তির অধিদেবতা, গণেশ—গণশক্তি বা শূদ্রশক্তি বা শ্রমশক্তি, সরস্বতী জ্ঞানশক্তি বা ব্রাহ্মণ্যশক্তি এবং লক্ষ্মী ধনশক্তি বা বৈশ্যশক্তি। দেবী দুর্গা মর্ত্যে আগমনের সময় পুত্রকন্যাস্বরূপ এই চারশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এ নিয়েই তাঁর সামগ্রিক রূপ।"

দেবী দুর্গার উদ্ভব নিয়ে দুটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটি পদ্মপুরাণের। সেখানে আছে রাত্রিদেবী ব্রহ্মার অনুরোধে হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করে উমার গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করেন—যা থেকে অনুমিত হয় বৈদিক দেবী রাত্রিই পৌরাণিক পার্বতীরূপে পূজিতা হয়েছেন। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে আছে, এটিই অধিক প্রচলিত। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের দ্বারা অবধ্য হওয়ায় বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাসবাণী প্রদান করে বলেছিলেন,

সকল দেবতার তেজ থেকে উৎপন্ন শক্তি সম্মিলিত হয়ে এক দেবীর রূপ পরিগ্রহ করবে। তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা।

এ তো গেল দুর্গার উৎসকথা। কিন্তু দুর্গাপূজার উদ্ভব কীভাবে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে—দুর্গাপূজা বৈদিক রুদ্রযজ্ঞের পরিবর্তিত রূপ। রুদ্রযজ্ঞের অগ্নিই দুর্গা। অন্যমতে বৈদিক যুগে শরৎকালেই নতুন বছর গণনা আরম্ভ হত এবং অনুমিত হয় যে এই নতুন বছরে রুদ্রযজ্ঞ সম্পন্ন হত। তাই রুদ্রযজ্ঞের বিবর্তিত রূপ দেবীপূজা শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়। আবার অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে দুর্গাপূজা আসলে প্রাচীন শারদোৎসব। অম্বিকা দেবীর নাম দুর্গা। অম্বিকা বলতে শরৎ ঋতুও বোঝায়। তিনি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে শরৎ ঋতুর পূজা করার অর্থই দেবী অম্বিকার পূজা অর্থাৎ দুর্গাপূজা করা। 'পূজা' তন্ত্রের অবদান, বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল না এবং সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন পুরাণে—তাই পৌরাণিক যুগেই এর উদ্ভব। হয়তো বৈদিক যুগে যে-শক্তির উন্মেষ, পুরাণের যুগে তার বিকাশ এবং সেই পূজার বিশেষ নিয়মকানুন রচিত হয়েছিল মধ্যযুগের বিখ্যাত পণ্ডিতদের প্রতিভায়। দুর্গাপূজার তত্ত্বগত ও প্রণালীগত দিক নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে চিহ্নিত বালক নামে এক স্মার্ত বাঙালি পণ্ডিত। তাঁর সমসাময়িক অপর একজন তাত্ত্বিক হলেন জীকন। ভবদেব ভট্ট ও শ্রীকর দত্ত এঁদের পরবর্তী তত্ত্বকার। কিন্তু বাংলার নব্য স্মৃতি যাঁর প্রতিভায় উদ্ভাসিত, যাঁর নির্দেশিত পূজা-পদ্ধতি অনুসারেই বর্তমান অধিকাংশ পূজার প্রচলন—তিনি হলেন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। দুর্গাপূজাসংক্রান্ত তাঁর তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়—দুর্গোৎসবতত্ত্ব, দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্ব। রঘুনন্দনের গ্রন্থে তন্ত্র ও পুরাণের প্রভাব ও উল্লেখ খুব বেশি দেখা যায়। তাঁর পূর্বেই তন্ত্র-পুরাণ অনুসারী পূজা প্রচলিত ছিল। সেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের অনেকখানিই পূজার অঙ্গ হিসেবে রঘুনন্দন গ্রহণ করেছিলেন।

রঘুনন্দন স্মৃতিতে দুর্গোৎসবের ছয়টি কল্পের বিধান আছে—কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টম্যাদি কল্প, মহানবমীকল্প। কেউ কেউ এর অতিরিক্ত মহাষ্টমীকল্প অর্থাৎ সর্বমোট সাতটি কল্প স্বীকার করেন। এর মধ্যে বঙ্গদেশ, বিহার ও আসাম অঞ্চলে ষষ্ঠ্যাদি কল্প প্রচলিত। এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের শাখায় দেবীর বোধন হয়। তারপরে আমন্ত্রণ ও অধিবাস। ওইদিনকার পূজা হয় ঘটে। পরে সপ্তমী থেকে তিনদিন মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পূজা। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে ও প্রতিপদাদি কল্পে যথাক্রমে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমীতে ও আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে দেবীর বোধন হয়। প্রথমকল্পে পক্ষব্যাপী ও দ্বিতীয় কল্পে নবরাত্রি মায়ের অর্চনা হয়ে থাকে। ষষ্ঠ্যাদি কল্পে চারদিন পূজা হয়। অনুরূপভাবে সপ্তম্যাদি, অষ্টম্যাদিকল্পে যথাক্রমে সপ্তমী থেকে তিনদিন ও অষ্টমী থেকে দুইদিন পূজা করে দশমীতে বিসর্জন হয়। অষ্টমী ও নবমীকল্প কেবলমাত্র একদিনেরই—উক্ত তিথিতে পূজা ও বিসর্জন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। বর্তমানকালে সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রভাবে আমরা অজ্ঞতাবশত সব তিথির পূর্বেই 'মহা' বিশেষণটি যোগ করে থাকি, যথা—মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী ইত্যাদি। কিন্তু এ-হেন ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত নয়। কেবলমাত্র অষ্টমী ও নবমীই এই অভিধা পেতে পারে। শাস্ত্রে আছে—"মহাবিপত্তারকত্বাদ্ গীয়তেঽসৌ মহাষ্টমী।/ মহাসম্পদ্দায়কত্বাৎ সা মহানবমী মতা॥" মহাশক্তির আবির্ভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করে সীতা দেবীর উদ্ধার সাধন করেন।

মহাবিপদ কেটে গেল বলে অষ্টমীর নাম হল মহাষ্টমী। মহাসম্পদ লাভ হল বলে নবমী হল মহানবমী।

কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে লিখেছেন—'অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।' তিনি একশো আট নীল পদ্ম দিয়ে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন : ''সায়াহ্ন কালেতে করিল বোধন।/ আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন।'' এই শারদীয়া দুর্গোৎসবকে অকালবোধন বলা হয়। বোধন কথার অর্থ জাগরণ। জাগরণের প্রয়োজন হয় নিদ্রিত থাকলে এবং রাত্রিকালে নিদ্রা থেকে জাগরণ যদি হয় তাহলে তা অকালের জাগরণ। আমাদের ছ-মাসে দেবতাদের একদিন এবং ছ-মাসে এক রাত। মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ছ-মাসকে উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত ছ-মাসকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়ণ দেবতাদের একদিন ও দক্ষিণায়ন দেবতাদের একরাত্রি; তাই শরৎকাল দক্ষিণায়নের অন্তর্গত, সেইসময় দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। এ-কারণে শারদীয়া পূজায় দেবীর জাগরণের জন্য বোধনের প্রয়োজন হয়। শরৎকালে দেবীকে বোধনের দ্বারা জাগাতে হয় বলে তাঁর অপর নাম 'শারদা'। বসন্ত ঋতু উত্তরায়ণে; তখন দেবতাদের দিন। তাই বাসন্তীপূজায় কোনও বোধন করতে হয় না। রাবণ এ-সময়ে মায়ের পূজা করেছিলেন; আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে রাজা সুরথও মধুমাসে দেবীর অর্চনা করেছিলেন। কিন্তু কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মা রাত্রি দেবীর বোধন করেছিলেন। দেবীভাগবতে বোধনের কোনও উল্লেখ নেই। দেবর্ষি নারদের পৌরোহিত্যে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রতের উদযাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে রামচন্দ্র বা ব্রহ্মার শরৎকালীন পূজা অকাল পূজা হলেও কালক্রমে সেটিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত পূজার বোধনমন্ত্রে আছে—''ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।/ অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥'' (হে দেবী, রাবণ বধের উদ্দেশ্যে এবং রামচন্দ্রকে অনুগৃহীত করবার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা অকালে তোমার বোধন করেছিলেন)।

গণেশের বউ বা কলাবউ নামে সাধারণের কাছে যা পরিচিত, তা আসলে নবপত্রিকা। কলাগাছ, কালো কচুগাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীগাছের শাখা, বেল, ডালিম, অশোক ডাল, মানকচু ও ধানের শিষ—এই নয়টিকে শ্বেত অপরাজিতার লতা ও হলুদ রঙের সুতো দিয়ে বেঁধে নবপত্রিকার পূজা করা হয়। পণ্ডিতদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্য উৎপাদনের জন্য পৃথ্বীদেবীর পূজা যে প্রচলিত ছিল, তারই স্মৃতি বহন করে এটি। নবপত্রিকা পূজা আসলে প্রতীকোপাসনা। এর প্রতিটি উদ্ভিদ দেবীর এক একটি প্রতীক। এই নয়টি চারার মধ্যে আছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী—ব্রহ্মাণী, কচুর—কালী, হলুদের—দুর্গা, জয়ন্তীর—কার্তিকী, বেলের—শিবা, ডালিমের—রক্তদন্তিকা, অশোকের—শোকরহিতা, মানকচুর—চামুণ্ডা ও ধানের—লক্ষ্মী। সমবেতভাবে নব-পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ দেখা যায় না। নবপত্রিকা পূজাবিধি পরবর্তী কালের।

দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে যে-পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাকে আমরা সন্ধিপূজা বলি। অষ্টমীর শেষ চব্বিশ মিনিট এবং নবমীর প্রথম চব্বিশ মিনিট—মোট আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যে এই পূজা সমাপন করতে হয়। পুরাণে আছে অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন রামচন্দ্র (পাতয়ামাস দশ বৈ মস্তকান্ কালসন্ধিকে)। সন্ধিপূজার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে আরও বলা হয়—''অষ্টমীনবমীসন্ধিকালোয়ং বৎসরাত্মকঃ।/ তত্রৈব নবমী ভাগঃ কালঃ কল্পাত্মকো মম॥'' (বৃহদ্ধর্মপুরাণ)—অষ্টমী-নবমীর

সন্ধিকালের পূজা এক বছরের তুল্য। অর্থাৎ দেবীর বর্ষব্যাপী পূজায় যে-ফল হয়, সন্ধির অষ্টমীভাগে একবার পূজা করলে সে-ফলের তুল্য ফল হয়। আর কল্পকাল পূজা করলে যে-ফল হয় সন্ধির নবমীভাগে পূজা করলে সে-ফল হয়। সন্ধিপূজায় দেবীর আবির্ভাব হয় চামুণ্ডারূপে। দেবীকে দীপমালা প্রদান এই পূজার অন্যতম অঙ্গ।

দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুমারীপূজা। দেবীপুরাণে এই পূজার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—''পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাঞ্ছুক্র কন্যাং বালাং তথৈব চ''—দেবীপূজার অঙ্গ হিসেবে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাবিহিত পূজা করবে। কুমারীপূজার মাহাত্ম্যকীর্তনে তন্ত্র পঞ্চমুখ। সেখানে বলা হয়েছে, কুমারীপূজা ছাড়া হোম প্রভৃতি কর্ম পরিপূর্ণ ফল প্রদান করে না, কুমারীকে পুষ্পদানে সুমেরু পরিমাণ ফল লাভ হয়, কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোকবাসীকে ভোজন করানো হয় ইত্যাদি। দুর্গাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথির তিনদিন বা কোনও একদিন ষোলো বছরের কমবয়স্কা কোনও কুমারীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি আছে। বিভিন্ন বয়সের কন্যাকে বিভিন্ন নামে পূজা করা হয়। এক বছরের কন্যা সন্ধ্যা, দু বছরের সরস্বতী, তিন বছরের ত্রিধামূর্তি, চার বছরের কালিকা, পাঁচ বছরের সুভগা, ছ বছরের উমা, সাত বছরের মালিনী, আট বছরের কুব্জিকা, ন বছরের কালসন্দর্ভা, দশ বছরের অপরাজিতা, এগারো বছরের রুদ্রাণী, বারো বছরের ভৈরবী, তেরো বছরের মহালক্ষ্মী, চোদ্দো বছরের পীঠনায়িকা, পনেরো বছরের ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোলো বছরের কুমারী অম্বিকা নামে পূজিতা হন। দেবীর কুমারী রূপ ও নাম বেদ-পুরাণের যুগ থেকে প্রচলিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবীকে কুমারী নামে অভিহিত করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও সেই পরমাত্মাকে স্ত্রী, পুরুষ, কুমার বা কুমারী বলা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে দেবী অম্বিকা কুমারী কন্যারূপে ব্রহ্মাদি দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে দেবীর বোধন করতে নির্দেশ দেন। এককথায় এ-পূজার সহজ সরল ব্যাখ্যা হল সকল নারীকে ভগবতী বুদ্ধিতে দেখা; শুদ্ধাত্মা কুমারীতে যেহেতু ভাগবতী সত্তার বেশি প্রকাশ তাই কুমারীপূজা।

পূজাস্থলে দেবীর আগমন ঘটে এবং পূজ্য-পূজকের মিলনে সেটি হয়ে ওঠে একটি পুণ্যক্ষেত্র। তাই যে-কোনও পূজার মতোই দুর্গাপূজাতেও স্থানবিধি রয়েছে। দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করার পক্ষে কোন কোন জায়গা অনুপযুক্ত বা অযোগ্য—তার নির্দেশ দিয়েছেন শূলপাণি। নিজের বসবাসের ঘর (বাড়ি নয়), বহু পুরানো স্থান, ইটের তৈরি জায়গা, দ্বীপ জ্বলে না এমন স্থান দুর্গাপূজার পক্ষে অযোগ্য। কোন কোন স্থান পূজার যোগ্য সে-সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বহু নির্দেশ আছে। বিল্বমূল, তুলসীকানন, দেবায়তন, গুরু সন্নিধান, যেখানে চিত্তের একাগ্রতা সহজে হয়,সর্বশেষে বলা হয়েছে : ''সর্ব্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নির্জ্জনং পশুবর্জ্জিতম্।'' আর একটি কৌতূহলের বিষয় হল দেবীর আগমন ও গমন। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস যে দুর্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন বিশেষ কোনও একটি যানে ও ফিরে যান আর একটি বাহনে। এই প্রত্যেকটি যানবাহনে যাত্রার ফল বা পরিণাম জ্যোতিষগণনায় নির্ধারিত আছে নিম্নোক্তভাবে : নৌকায় আগমন ও গমন—ফল শস্যবৃদ্ধি বা জলবৃদ্ধি। দোলায় আগমন ও গমন—ফল মড়ক। গজে আগমন ও গমন—ফল শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। ঘোটকে আগমন ও গমন—ফল ছত্রভঙ্গ।

দেবীভাগবতে (৭।৩৯।৩) আছে : ''দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।/ বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা॥'' দেবী বলছেন—আমার পূজা দুরকম—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্যপূজা আবার দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক। এখন প্রশ্ন

দুর্গাপূজা বৈদিক না তান্ত্রিক? পূর্বেই বলা হয়েছে পূজার ধারণাটি তন্ত্রের অবদান তাই অন্যান্য পূজার মতো দুর্গাপূজা তান্ত্রিক। আবার দেবী দুর্গা ও তাঁর পূজা পুরাণে বর্ণিত এবং পুরাণ বেদানুসারী, সেইদিক দিয়ে এই পূজাকে বৈদিকপূজাও বলা চলে। তবে এককথায় এ-পূজার কোনও শ্রেণীকরণ করতে গেলে বলতে হয়—এ হল 'মহাপূজা'। মহাস্নান, পূজা, হোম ও বলিদান—এই চারটির সমন্বয়ে যে-পূজা সম্পন্ন হয় তা হল মহাপূজা। দেবীপুরাণে (২২।২৩) দুর্গাপূজাকে 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভক্তিসহকারে পূজা করলে অশ্বমেধযজ্ঞের সমান ফলপ্রাপ্তি ঘটে বলে একে 'কলির অশ্বমেধ'ও বলা হয়। আবার প্রাচীন বেদান্তে স্বরূপ উপাসনা, সম্পদ উপাসনা ও প্রতীকোপাসনা—এই যে ত্রিবিধ উপাসনার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দুর্গার মূর্তিপূজা বা প্রতিমাপূজা ঠিক প্রতীকের পর্যায়ে পড়ে না। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, ''মায়ের পূজা সম্পদে প্রতীকে মিশ্রিত। দুর্গা বিশ্ব-মাতা, 'জগতাং ধাত্রী'। দুর্গার মূর্তি ভাবময়ী মূর্তি, পূজাও ভাবের পূজা। 'দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়'।''

তবু প্রশ্ন জাগে কেন এই পূজা? সাধারণভাবে এ-পূজার সার্থকতাই বা কী? উত্তরে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর 'চণ্ডীচিন্তার' অনুসরণে বলতে হয় পূজার দুটো দিক—একটি বাইরের দিক, সেটি বিজ্ঞানধর্মী, অপরটি অন্তরের দিক, সেটি আত্মধর্মী। বাইরের দিক থেকে পূজা একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থাবিশেষ। অন্তরের দিক থেকে পূজা একটি আত্মধর্মী প্রেমপূর্ণ সমর্পণবিশেষ। প্রথমটির উদ্দেশ্য মহাশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ স্থাপন আর দ্বিতীয়টি যেন মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে-চিরসম্বন্ধ তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা। দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং সীতারূপী মহাসম্পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তাতে কী? আমরা দেবীর বোধন ও পূজা করে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাব আর কী মহাসম্পদই বা লাভ করব? উত্তরে বলা যেতে পারে—যিনি পূজক তিনি শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসারাশ্রমী সাধারণ নরনারীর দারিদ্র্যই মহাবিপদ, ঐশ্বর্যই মহাসম্পদ, জীবনযাত্রাই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে মহাবিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে মহাসম্পদ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে, স্মরণীয় : 'দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণী কা ত্বদন্যা' (চণ্ডী ৪।১৭)। যাঁরা যোগী, সাধনই তাঁদের সমর, বিষয়বন্ধনই তাঁদের মহাবিপদ, মুক্তিলাভই মহাসম্পদ। জগজ্জননীর অর্চনায় যোগী সাধনসমরে জয়লাভ করেন, তাঁর ভববন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি মুক্তি-সুখে ডুবে যান, স্মরণীয় : 'যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ' (চণ্ডী ৪।৯)। যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাঁদের মহাবিপদ, ব্রহ্মজ্ঞানই পরমধন। মহাদেবীর অর্চনায় সাধনযুদ্ধে তাঁরা জয়লাভ করেন, কারণ জগজ্জননী নিজেই মূর্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। যাঁরা ভক্তিপথের উপাসক, তাঁদের ভক্তিরূপিণী সীতাদেবীকে চুরি করে নিয়ে গেছে অপরাধরূপী রাবণ—এই বেদনা তাঁদেরকে বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধরূপী দশাননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেমভক্তিরূপিণী সীতার উদ্ধার হয় মহানবমীতে। দশমীতে এই পরম সত্যানুভূতিকে হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্জন করে ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেন।

দুর্গাপূজার সার্থকতা তাই কেবল পূজারূপে নয়, পূজাকে কেন্দ্র করে যে-উৎসব তার কেন্দ্রবিন্দুরূপে। 'দু-এক কথা'র মাঝে এটিই যেন মূলকথা!